বুদ্ধ

১ম পরিচ্ছেদ

শাক্যমুণি বুদ্ধ

১

বুদ্ধের জীবন কথা

১। হিমালয় পর্বতের দক্ষিন পার্শ্বের পাদদেশে প্রবাহিত রোহিনী নদীর তীরে শাক্য গোত্রীয় লোকদের বসবাস ছিল। তাঁদের রাজা শুদ্ধোধন গৌতম কপিলাবস্তুতে সেই জনগোষ্ঠীর রাজধানী স্হাপন করেন। তিনি এক বিশাল রাজপ্রাসাদ তৈরী করে প্রজাদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে রাজ্য শাসন করে আসছিলেন।

তাঁর রানীর নাম ছিল মায়া। তিনি শুদ্ধোধন রাজার মামাতো বোন ছিলেন, এবং তাঁর পিতাও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাক্যবংশীয় রাজা ছিলেন।

বিয়ের পর বিশ বছর পর্যন্ত তাঁদের কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রে রানী মায়া এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। তাহলো, তিনি তাঁর বুকের ডান পার্শ্ব দিয়ে এক সাদা হাতী গর্ভে প্রবেশ করছে, এরূপ অনুভব করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই তিনি গর্ভবতী হলেন। এতে রাজা এবং প্রজাগণ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর আগমনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেকালের প্রথানুসারে রানী মায়া তাঁর পিতৃ গৃহেই সন্তানের জন্মদানের উদ্দেশ্যে পিত্রালয়ের দিকে যথাসময়ে রওনা হলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর আলোকোজ্জ্বল বসন্তের এক দিনে, রানী পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

তখন রানীর সর্বশরীরের উপর ঝরে পড়ছিল শুভ্র অশোক ফুল। প্রফুল্ল মনে তিনি ডান হাত বাড়ালেন অশোক বৃক্ষের এক ঢাল ধরতে। আর এ মুহূর্তেই তিনি প্রসব

করলেন রাজকুমারকে। রানীর মহিমা এবং তাঁর নবজাতকের রাজকীয় এই জন্মে, স্বর্গ মর্ত্যের সকলের অন্তর উদ্বেলিত হলো অপার আনন্দে। এই স্মরণীয় দিনটি ছিল ৮ই এপ্রিল।

এই সন্তানের নিরাপদ জন্মে, রাজার আনন্দ ছিল সবচেয়ে বেশী। তিনি আপন সন্তানের নাম রাখলেন সিদ্ধার্থ। যার অর্থ হলো "সমস্ত আশার পরিপূর্ণতা লাভ।"

২। কিছু দিন পর, রাজপ্রাসাদের এই আনন্দ উৎসব হঠাৎ বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল, প্রিয়তমা রানী মায়াদেবীর হঠাৎ মৃত্যুতে। ফলে, রানীর ছোট বোন মহাপ্রজাপতি রাজকুমারের লালন পালনের ভার গ্রহণ করলেন। তিনি পরম মাতৃ স্নেহে বড় করে তুলতে লাগলেন মাতৃহারা কুমারকে।

তখন অসিত নামের এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী পাহাড়ের অনতিদূরে বাস করতেন। তিনি রাজপ্রাসাদের উপরে এক উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ দর্শন করলেন। ইহা এক মহামংগলের পূর্বাভাস জেনে তিনি রাজপ্রাসাদে আগমন করলেন। রাজকুমারকে দর্শন করানো হলে, তিনি এই বলে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন, "যদি এই শিশু রাজপ্রাসাদে অবস্হান করেন, তাহলে বড় হয়ে একদিন তিনি জগৎ বিখ্যাত রাজা হবেন; আর যদি সংসার ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি হবেন জগত পরিত্রাতা বুদ্ধ।"

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে রাজা খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু পরে একমাত্র পুত্রের সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার সম্ভাব্যতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

রাজকুমারের বয়স যখন ৭ বৎসর তখন তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও সামরিক বিষয়ে পাঠ গ্রহণ শুরু করলেন কিন্তু তাঁর মনের ঝোঁক ছিল এই বিষয়গুলোর চেয়ে অন্য বিষয়ে জানার জন্যে। বসন্তের একদিনে রাজকুমার তাঁর পিতার সাথে বেড়াতে প্রাসাদ হতে বের হলেন। তখন তাঁরা উভয়ে এক কৃষকের ভূমিকর্ষণ দেখছিলেন। রাজকুমার লক্ষ্য করলেন, এক পাখি ভূমিতে অবতরণ করে একটি কেঁচোকে ধরে নিয়ে গেল। চাষার লাংগলের ফলায় এটি মাটির উপরে উঠে এসেছিল। এটা দর্শন করে রাজকুমার এক গাছের ছায়ার নিচে বসে একা একা গভীরভাবে চিন্তা করতে

লাগলেন যে ঃ

"হায়রে ! জগতের সকল প্রাণীই কি একে অপরকে এভাবে হত্যা করে ?"

রাজকুমার, যিনি তাঁর মাতাকে জন্মের অল্প কিছুদিনের মধ্যে হারালেন, তিনি এই ছোট প্রাণীগুলোর মর্মান্তিক অবস্হা দেখে অন্তরে গভীরভাবে বেদনা অনুভব করলেন।

রাজকুমার দিন দিন যত বড় হচ্ছেন তত এ মানসিক বেদনা অধিকতরভাবে অনুভব করতে লাগলেন। এটা যেন চারাগাছের মধ্যে গভীর ক্ষত চিহ্নের ন্যায়। মানব জীবনের দুঃখ সত্য এভাবে তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করতে শুরু করলো।

রাজা রাজকুমারের এই অবস্হা দর্শন করে অসিত সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করলেন। এতে রাজার মানসিক পীড়া আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। ফলে, তিনি রাজকুমারের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে ভোগ বিলাসের প্রতি আকর্ষণের সকল পন্হা অবলম্বন করলেন। রাজা ১৯ বৎসর বয়সে রাজকুমারী যশোধারার সাথে রাজকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। রাজকুমারী যশোধারা দেবদাহ রাজ্যের রাজা এবং স্বর্গীয়া রানী মায়ার ভাই সুপ্রবুদ্ধের কন্যা ছিলেন।

৩। বিবাহের পর ১০ বছর যাবৎ বসন্ত, শরৎ ও বর্ষা ঋতুর উপযোগী করে নির্মিত প্রাসাদে নাচ, গান ও নানা আনন্দের মধ্যে অবস্হান করেও রাজকুমার সিদ্ধার্থের মন এগুলোতে রমিত হলো না। তিনি সর্বদা দুঃখের কারণ অনুসন্ধান এবং মানব জীবনের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, "রাজপ্রসাদের এ আরাম-আয়েশ, আমার এই সু-স্বাস্হ্য এবং যৌবনের এ আনন্দ-আমার জীবনে এগুলো কোন সদর্থ বয়ে আনতে পারে কি ? একদিন আমাদেরকে রোগগ্রস্ত হতে হবে, বৃদ্ধ হতে হবে, এবং অবশেষে

মৃত্যুর হাত থেকে কেহই রেহাই পাবে না। যৌবনের গর্ব, সু-স্বাস্থ্যের গর্ব এবং বেঁচে থাকার গর্ব সবকিছুই একদিন ত্যাগ করে চলে যেতে হবে আমাদেরকে।"

"একজন মানুষ বাঁচার জন্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে আসছে এবং এর পিছনে স্বভাবতই কাজ করছে অনেক আশা-আকাঙ্খার মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন দু'ভাবে হতে পারে-সঠিক ধারণা ও ভুল ধারণার মাধ্যমে। রোগ, বার্ধক্য, ও মৃত্যুকে পরিহার করতে পারবে ইহা ভুল ধারণা।"

"যদি সে সঠিক ধারণার মাধ্যমে রোগের প্রকৃত স্বরূপ, বার্ধক্যের প্রকৃত স্বরূপ এবং মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বুঝতে পারে, তাহলে সে জীবজগতের মুক্তির পথ নির্দেশনা দিতে পারবে। আমি আরাম-আয়েশের মাধ্যমে আমার এই জীবন যাত্রাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছি।"

৪। অতঃপর, রাজকুমার যখন ২৯ বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ হলেন তখন রাহুল নামক তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলো এবং সাথে সাথে তাঁর মনে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপিত হলো এই ভেবে, সন্তানের প্রতি পিতার অপত্য স্নেহ যেন আমরণ বন্ধনে আবদ্ধ না করে। পরে তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্যে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন রাত্রে সিদ্ধার্থ তাঁর ঘোড়া চালক চন্দক এবং প্রিয় সাদা ঘোড়া কন্হককে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

তখনও তাঁর মানসিক বেদনার পরিসমাপ্তি হয়নি। মনের অপদেবতাগণ তাঁকে বলতে লাগলো, "সিদ্ধার্থ তুমি রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়াটাই সর্বোত্তম। কারণ এই পৃথিবী খুব শীঘ্রই তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।" মানস দেবতাকে রাজপুত্র বললেন, "এই পৃথিবী আমার প্রয়োজন নেই।" তারপর তিনি তাঁর মাথার চুলগুলো কেটে ফেললেন এবং ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে দক্ষিন দিকে রওনা হলেন।

রাজকুমার প্রথমে ভর্গব মুনির কুঠিরে গমন করলেন। তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা সতর্কতার সাথে দর্শন করলেন। অতঃপর তিনি আরাল কালাম এবং রামপুত্র রুদ্রক এর নিকট গিয়ে তাঁদের সাধনানীতি জানার চেষ্টা করলেন। সর্বশেষে তিনি মগধ রাজ্যের গয়া

গ্রামের পার্শ্বে প্রবাহিত নৈরঞ্জনা নদীর অববাহিকায় উরুবেলা নামক বনে সাধনায় রত হলেন।

৫। তাঁর সাধনা পদ্ধতি ছিলো অতুলনীয়ভাবে কঠিন। তিনি এই সাধনার ব্যাপারে বলেছিলেন, "কোন সাধকই অতীতে এবং বর্তমানে এত কঠিন সাধনা করেননি যা আমি চর্চা করেছি এবং যা ভবিষ্যতেও সম্ভব নহে।"

তথাপি তিনি তখনও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যে উপনীত হতে পারেননি। তাই ৬ বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনার পরে তিনি তা ত্যাগ করলেন। অতঃপর তিনি পার্শ্বের নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের সুজাতা নামক এক গৃহিনী হতে এক কাপ দুধ গ্রহণ করলেন। যখন তিনি সুজাতার হাত হতে দুধ গ্রহণ করলেন তখন অপর ৫ সঙ্গী যাঁরা ৬ বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে সাধনারত ছিলেন তাঁরা রাজকুমারের চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনে হানি ঘটেছে এরূপ চিন্তা করে তাঁকে পরিত্যাগ করলেন।

অতঃপর রাজকুমার একাকী অবস্হান করতে লাগলেন। যদিও তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তবুও জীবনাবসানের ঝুঁকি নিয়ে সাধনারত হওয়ার পূর্বে সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, "আমার শরীরের রক্ত শুকিয়ে যেতে পারে, মাংস খসে পড়তে পারে, হাড় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে তবুও আমি আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বে এই আসন হতে এক বিন্দুও নড়বো না।"

ইহা তাঁর জন্যে তীব্র এবং অতীব কঠিন শপথ ছিলো। কারণ ইতিমধ্যে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মন কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাঁর মনে শতশত কালো ছায়া এসে ভিড় করছিল। এক কথায় বলতে গেলে তিনি সকল প্রকার মারের বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই জীবন মরণ সংকল্পের পর তিনি সর্তকতা এবং ধৈর্য্যের সাথে একটার পর একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মারের সকল বন্ধন ছেদন করলেন। এটা ছিল তাঁর জন্যে অগ্নি পরীক্ষা তুল্য এবং এতে তাঁর রক্ত চলাচল সূক্ষ্ম হয়ে গেল, শরীরের মাংস শুকিয়ে গেল এবং হাড় বাহির হয়ে আসল।

এভাবে একদিন রাত্রিগত হয়ে পূর্বাকাশে যখন দিনমণি তার রক্তিম আভা ছড়িয়ে

আবির্ভূত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজকুমারের মনের সমস্ত কালো ছায়া বিদূরিত হয়ে মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আকাশের ন্যায় তাঁর মন আলোকিত হলো। অবশেষে তিনি তাঁর পরম পাওয়া বোধিজ্ঞান লাভ করলেন। তাঁর বয়স যখন ৩৫ বৎসর পূর্ণ হলো তখন তিনি বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভ করলেন আর ঐ দিনটি ছিল ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখ।

৬। সে সময় হতে রাজকুমার বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেন। কেহ তাঁকে বুদ্ধ, কেহ সম্মাসম্বুদ্ধ, কেহ তথাগত, আবার কেহবা শাক্যবংশের মহাজ্ঞানী শাক্যমুণি, কেহবা বিশ্বনন্দিত ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করতে লাগলেন।

অতঃপর তিনি তাঁর ৫ জন বন্ধু যারা এক সাথে ৬ বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনারত ছিলেন এবং পরে তাঁকে ছেড়ে চলে যান, তাঁদেরকে দর্শনের জন্যে বারানসীর মৃগদাবে গমন করলেন। বুদ্ধকে দেখে প্রথমে তাঁরা এড়িয়ে চলতে চাইলেন, পরে তাঁর সাথে আলাপ করে অনুধাবন করতে পারলেন যে তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন এবং পরিশেষে তাঁরা বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করে তাঁর প্রথম অনুসারী হলেন। অতঃপর বুদ্ধ তাঁর বাল্যবন্ধু রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের নিকট গমন করলেন এবং তাঁকেও তাঁর অনুসারী হিসেবে পেলেন। তারপর থেকে তিনি দেশে দেশে ভিক্ষান্নের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে সাধারন জনগণকে তাঁর শিক্ষা এবং জীবন যাত্রা সম্পর্কে প্রচার করতে লাগলেন।

ঠিক সে সময়ে মানুষ তৃষিতের ন্যায় এবং ক্ষুধার্তের ন্যায় তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তখন সারিপুত্র এবং মোদগল্যায়ন নামক দুই প্রধান শিষ্য তাদের ২ হাজার অনুসারী সহ বুদ্ধের শরণাপন্ন হলেন।

রাজকুমারের পিতা তাঁর গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তে প্রথমে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন, অথচ পরে তিনি নিজেও বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করেছিলেন। মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের বিমাতা, রাজকুমারের স্ত্রী যশোধরা সহ শাক্যবংশের অন্যান্যরাও পরে বুদ্ধের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্হাপন করেছিলেন।

৭। বুদ্ধের শিক্ষা প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে ৪৫ বৎসর যাবৎ প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর বয়স যখন ৮০ বৎসর তখন তিনি বৈশালীতে ছিলেন। সে সময়ে ধর্ম প্রচারে যখন তিনি রাজগৃহ হতে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, প্রতিমধ্যে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে ৩ মাস পর পরিনির্বাপিত হবেন বলে ঘোষণা করলেন। তখনও তিনি তাঁর ধর্মযাত্রা স্হগিত করেননি। অতঃপর বুদ্ধ পাবায় উপস্হিত হলেন এবং স্বর্ণকার চুন্দের প্রদত্ত আহার গ্রহণ করে খুব বেশী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এতে তিনি শরীরে তীব্র বেদনা এবং দুর্বলতা অনুভব করলেন। এর পরেও পায়ে হেঁটে তিনি কুশীনগর সীমান্তের নিকটবর্তী এক শালবনে উপস্হিত হলেন।

তিনি তাঁর পরিনির্বাণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দু'টি বৃহৎ শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী স্হানে শায়িত অবস্হায় শিষ্যসংঘকে দেশনা করেছিলেন। অতঃপর তিনি এই পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে তাঁর সমস্ত করণীয় কাজ শেষ করে পরম শান্তিপদ মহাপরিনির্বাণ সাক্ষাৎ করেছিলেন।

৮। বুদ্ধের খুবই নিকটতম শিষ্য আনন্দের তত্ত্বাবধানে এবং কুশীনগরের জনগণের সাহায্য সহযোগিতায় তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

পার্শ্ববর্তী ৭টি রাজ্যের রাজাগণ সহ অজাতশত্রু বুদ্ধের পুতস্হি সবার মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। এই প্রার্থনা প্রথমে কুশীনগরবাসী প্রত্যাখান করেন এবং এর জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অবশেষে দ্রোণ পন্ডিতের উপদেশে এই সমস্যার সমাধান হয় এবং ৮টি বড় রাজ্যে এই পুতস্হি সমভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। শ্মশানের ছাই এবং মাটি যেগুলো ছিল তাও পরবর্তীতে সম্মান স্বরূপ ২ রাজ্যে ভাগ করে দেয়া হল। অতঃপর ১০টি রাজ্যে বুদ্ধকে পুজা অর্চনা করার উদ্দেশ্যে ঐ পুতস্হির উপর ১০টি সুবৃহৎ চৈত্য নির্মাণ করা হল।

২

বুদ্ধের শেষ শিক্ষা

১। কুশীনগরের শালবৃক্ষের নীচে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রতি শেষ শিক্ষা দিলেন, যা হলো ঃ

"তোমরা নিজেই নিজেকে আলোকবর্তিকা হিসেবে গড়ে তোল। নিজেকে নিজের বিশ্বস্ত হিসেবে গড়ে তোল। এই জন্যে কারও উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ নয়। আমার শিক্ষাকে তোমাদের পথচলার আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পার এবং এগুলোতেই বিশ্বস্ত হও, অন্য কোন শিক্ষাতে তোমাদের নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ নয়।"

শরীরের প্রতি মনোযোগ দাও এবং ইহা যে পুতি দুর্গন্ধময় তা ভাবার চেষ্টা কর। শরীরের দুঃখ এবং সুখ দু'টিই দুঃখের কারণ। কিভাবে তুমি এর প্রতি রমিত হতে পারো ? তোমরা 'আমিত্ব' শব্দের অসারত্বে মনোযোগ দাও এবং এর অস্হায়ীত্বের কথা ভাবার চেষ্টা করো। কিভাবে তুমি এই 'আমিত্বের' প্রতি মোহগ্রস্ত হতে পারো ? কিভাবে একে পরিচর্যা করতে পারো এবং অহংবোধ করতে পারো ? এই সব ভাবনার মাধ্যমে দুঃখকে সঠিকভাবে জানলে তার পরিসমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনোযোগ দাও। এতে তুমি কোথায় 'আমিত্ব' খুঁজে পাবে ? এগুলোকে এক সাথে আবদ্ধ বস্তু বা স্কন্ধ কি বলা যায় না ? এবং এগুলো আজ না হয় কাল কি নিশ্চয়ই টুকরা টুকরা হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না ? তোমরা দুঃখ সত্যকে না বুঝলে বিপথে যাবে। আমি পরিনির্বাপিত হলেও আমার শিক্ষা তোমাদের জন্যে রয়েছে এবং এগুলো অনুশীলন, অনুধাবন করে তোমরা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। যদি তোমরা সঠিকভাবে আমার ধর্ম প্রতিপালন করো তাহলে তোমরাই আমার প্রকৃত অনুসারী হবে।"

২। "শিষ্যগণ, যে শিক্ষা আমি তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি তা কখনও ভুলার এবং বর্জনের নয়। এগুলো সর্বকালের জন্যে সম্পদ, শিক্ষনীয় বিষয় এবং চর্চার বিষয়।

যদি তোমরা এই শিক্ষা অনুসরণ কর তাহলে তোমরা সব সময় সুখী হবে।"

"মনকে সংযম করাই এই শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। লোভ থেকে মনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে চরিত্রবান হওয়া যায় এবং চিত্তে বিশুদ্ধি লাভ করা যায়। এতে নিজের বাক্যও পরিশুদ্ধিতা লাভ করে। সদা জীবনের নশ্বরতার কথা ভাবলে লোভ এবং সর্বপ্রকার অকুশল কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।"

"যদি তুমি দেখ যে, তোমার মন লোভের ফাঁদে পড়ে প্রলুব্ধ হচ্ছে, তখন তোমার উচিৎ লোভের প্রলোভন হতে মনকে সংযত ও দমন করা; নিজেই নিজের মনের নিয়ন্ত্রক হও।"

"একজন মানুষের মন তাকে বুদ্ধ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, আবার পশু হিসেবেও গড়ে তুলতে পারে। অপকর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ অপশক্তির দ্বারা ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে, আবার বিপরীতে সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষ সর্বজ্ঞ বুদ্ধও হতে পারে। তাই নিজের মনকে আয়ত্তে রাখা এবং সৎ পথ থেকে বাহিরে না যায় মত সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ।"

৩। "তোমাদের উচিৎ একে অপরকে সম্মান করা, ধর্ম প্রতিপালন করা, কলহ থেকে বিরত থাকা। জল এবং তৈলের ন্যায় পৃথক পৃথক থাকা তোমাদের উচিৎ নয়। তোমাদের উচিৎ দুধ এবং পানির ন্যায় একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অবস্হান করা।"

"এক সাথে শিক্ষা কর, দক্ষতা অর্জন কর এবং ধর্মচর্চা কর, মন এবং সময়কে অকার্য্যে এবং কলহে ব্যবহার করো না। নৈর্বাণিক আনন্দ, মার্গ ও ফল উপভোগ করার চেষ্টা করো।"

"যে শিক্ষা আমি তোমাদের জন্যে প্রচার করেছি তা আমার দ্বারা সৃষ্ট এবং তা আমার দ্বারা আবিষ্কৃত পথ। যে কোন মুহূর্তে তোমরা এসে এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারো।"

"যদি এই ধর্মকে তোমরা সঠিকভাবে বুঝ অথবা জ্ঞাত হও তাহলে তোমরা আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে অবস্হান করেও ধর্মকে সঠিকভাবে গ্রহণ করলে এবং চর্চা করলে, তোমরা দূরে থাকলেও আমার অতি নিকটে বলে জানবে।"

৪। "হে সৌম্যগণ ! আমি আর বেশীদিন তোমাদের সম্মুখে থাকবো না; কিন্তু তাই বলে তোমরা অনুতাপ করবে না। জীবন চিরস্হায়ী নয়। কেহই এই নশ্বর দেহকে ধরে রাখতে পারবে না। আমার বর্তমানের এই শরীর মৃত্যুর পরেই ধ্বংস প্রাপ্ত শকটের ন্যায় অদূরে কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; যা এতদিন 'আমি' 'আমার' বলে বলে আসছিলাম।"

"তোমরা বৃথা পরিতাপ করো না, কিন্তু অনুধাবন করার চেষ্টা কর যে, এই পৃথিবীতে অবিনশ্বর নামের কিছুই নেই; যা এই জীবনের নিশ্চিত অবসান সেই মৃত্যু থেকে আমরা বুঝতে পারি। অকুশল চেতনা পোষণ করো না, এতে যেই দুঃখ ক্ষয়শীল, পরিবর্তনশীল, তা আবার অপরিবর্তিতও হতে পারে।"

"তীব্র বস্তুগত ভোগাকাঙ্খা সর্বদা মানুষের মনকে প্রভাবিত করার পথ খুঁজে বেড়ায়। যদি কোন বিষধর সর্পসহ একই কক্ষের মধ্যে অবস্হান করা হয়, তখন নিশ্চিন্তে ঘুম যেতে হলে আগে ঐ সর্পটিকে নিজের কক্ষ থেকে বের করে দিতে হবে।"

"তোমাদেরকে বিষধর সর্পের ন্যায় বৈষয়িক সমস্ত বন্ধন ক্ষয় করতে হবে। তাই তোমরা অবশ্যই তোমাদের মনকে পাহারার মাধ্যমে রক্ষা করবে।"

৫। "হে শিষ্যগণ ! আমার শেষ দিবস খুবই সন্নিকটে, কিন্তু তোমরা মনে রেখো যে, মৃত্যু মানে শুধুমাত্র এ রূপগত দেহের বিলীন মাত্র। এই দেহ পিতা-মাতা দ্বারা সৃষ্ট এবং খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে আসছে; রোগ ও মৃত্যু এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র।"

শাক্যমুণি বুদ্ধ

"কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধ মানবীয় দেহ নহে--ইহা হলো বোধিজ্ঞান। মানবীয় দেহের অবসান আছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম ও ধর্মচর্চার মধ্যে বুদ্ধজ্ঞান সর্বদা বিরাজমান থাকে। যে শুধু আমার দেহ দর্শন করে, সে প্রকৃত পক্ষে আমাকে দর্শন করে না। যে আমার ধর্মকে দর্শন করে, শুধু সেই আমাকে প্রকৃত দর্শন করে।"

"আমার মৃত্যুর পরে ধর্মই তোমাদের শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হবে। ধর্মকে অনুসরণ করলে আমার দর্শনও পাবে।"

"আমার জীবনের শেষ ৪৫ বৎসর আমি আমার শিক্ষার কিছুই তোমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখিনি। এই শিক্ষাতে অপ্রকাশিত, গোপনীয় অর্থ বলতে কিছুই নেই; সব আমি তোমাদের জন্যে খোলাভাবে এবং পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছি। আমার প্রিয় শিষ্যগণ ! ইহাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পরিনির্বাপিত হবো। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ নির্দেশ।"

২য় পরিচ্ছেদ

চিরন্তন সত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা

১

বুদ্ধের করুণা ও তাঁর ব্রত

১। বুদ্ধ চিত্ত মানে মহামৈত্রী ও করুণায় পরিপূর্ণ। মহামৈত্রী চিত্ত মানে সর্বক্ষেত্রে সর্ব সময়ে জগতের সকল প্রাণীকে রক্ষা করা বা অভয় দান করার আকুল আগ্রহ। মহাকরুণা চিত্ত মানে মানুষের পীড়িত অবস্থায় পীড়িত হওয়ার বেদনা নিজের মধ্যেও অনুভব করা এবং মানুষের দুঃখের সময়ে দুঃখিত হওয়া।

বুদ্ধ বলেন, "তোমাদের দুঃখ মানে আমারই দুঃখ; তোমাদের সুখ মানে আমারই সুখ।" ইহা এরূপেও ভাবা যেতে পারে, "মা যেমন নিজের পুত্রকে সর্বদা ভালোবাসেন এবং পুত্রের প্রতি তাঁর এই চিত্ত এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারেন না।" চিত্তের এরূপ অবস্থাকে বুদ্ধের প্রকৃত মৈত্রী করুণা বলা যেতে পারে।

বুদ্ধের করুণাঘন চিত্ত মানুষের প্রয়োজনানুসারে তাদেরকে উদ্দীপিত করে থাকে। এই করুণাঘন চিত্তের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, প্রেরণা হিসেবে দেখা দেয় এবং ঐ প্রেরণা তাদেরকে বোধিজ্ঞান লাভে সহায়তা দান করে। এরূপে মা যেমন তাঁর শিশুকে ভালোবেসে মাতৃত্ববোধ অনুধাবন করেন, তেমনি শিশুও এই ভালোবাসা হতে প্রেরণা লাভ করে নিজেকে নিরাপদ অনুভব করে।

অজ্ঞতা হতে সৃষ্ট মোহ ও তৃষ্ণার কারণে মানুষ দুঃখ ভোগ করে আসছে; যার দরুন মানুষ করুণাঘন বুদ্ধ চিত্ত বুঝতে অক্ষম। তারা নিজেদের বৈষয়িক চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট কাজের ফল ভোগ করে থাকে এবং নিজের অকুশল কাজের ভারে মন ভারী হয়ে মোহের পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

চিরন্তনসত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা

২। বুদ্ধের করুণাঘন চিত্ত শুধু বর্তমান জীব জগতের জন্য নয় এবং ইহার কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমাও নাই। অজ্ঞতার কারণে মানুষ বিপথে ধাবিত হওয়ার দরুন, অনির্দিষ্ট কাল থেকে মানুষের প্রতি বুদ্ধের করুণাঘন চিত্তের উদ্ভব হয়েছে।

তাই চিরন্তনসত্য বুদ্ধ, সর্বদা মানুষের পূর্বেই এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে মানুষের সাথে পরম বন্ধুত্ব সুলভ অবস্থানের মাধ্যমে মানুষকে ধার্মিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করে আসছেন।

শাক্যমুণি বুদ্ধ রাজকুমার হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও তিনি রাজবাড়ীর সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করে কঠোর তপস্যা ব্রত গ্রহণ করেন। নীরব ভাবনার মাধ্যমেই তিনি বোধিজ্ঞান অনুধাবন করেন। তারপর তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এই জ্ঞান বিতরণ করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পার্থিব জীবন অবসানের কথাও ঘোষণা করেন।

বুদ্ধজ্ঞানের কোন পরিসমাপ্তি নেই। তেমনি মানুষের অজ্ঞতারও কোন শেষ নেই। অজ্ঞতার যেমন শেষ নেই তেমনি বুদ্ধের করুণারও কোন সীমা পরিসীমা নেই।

বুদ্ধ যখন এই পার্থিব জীবন অবসানের কথা ঘোষণা করলেন, তখন তিনি ৪টি সংকল্পের কথা প্রকাশ করলেন। যথা- ১। সমস্ত প্রাণীজগতকে রক্ষা করা ২। সমস্ত পার্থিব কামনা ও বাসনাকে সীমিত রেখে পরকল্যাণে ব্রতী হওয়া, ৩। সমস্ত শিক্ষা অধিগত করা এবং ৪। সম্যক সম্বোধি লাভ করা। এ সংকল্পগুলোই মৈত্রী ও করুণার ঘোষণা যা বুদ্ধত্ব লাভের জন্যে অপরিহার্য্য বিষয়।

৩। বুদ্ধ প্রথমেই নিজে শিক্ষা গ্রহণ করলেন যে, প্রাণী হত্যাজনিত পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, দীর্ঘজীবনের কি মহিমা মানুষ তা জানুক।

বুদ্ধ চুরি করা জনিত পাপ কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্যে নিজেকে গড়ে

তুললেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যে সকল প্রাণী তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদশালী হউক।

বুদ্ধ ব্যভিচারজনিত পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে নিজেকে গড়ে তুললেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যে, মানুষ তাদের পবিত্রতা সম্পর্কে জানুক এবং তৃপ্তিহীন কামনা, বাসনা ও কষ্টভোগ না করুক।

বুদ্ধ নিজের ধারণাগত দিক থেকে সকল প্রকার শঠতা হতে মুক্ত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করলেন এবং এর ফলে তিনি প্রার্থনা করলেন যে, সকল মানুষ মানসিক প্রশান্তির কথা জানুক। যা সত্য কথা বলা থেকে অনুভব করা যায়।

তিনি শঠ কথা না বলার শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, সকল মানুষ বন্ধুত্বের আনন্দ সম্পর্কে জানুক।

তিনি অপরকে অপবাদ না দেয়ার শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, সকলের শান্ত মন থাকা প্রয়োজন যা অন্যকে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে সাহায্য করে।

তিনি নিজেকে অমূলক কথাবার্তা বলা থেকে মুক্ত রাখলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, সকলে সমবেদনা মূলক অনুভূতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অনুধাবন করুক।

বুদ্ধ লোভ থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে, লোভমুক্ত মন মানুষের মনে যে কতটুকু প্রশান্তি আনয়ন করতে পারে, মানুষ তা জানুক।

তিনি ক্রোধ চিত্ত ত্যাগ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে; সকল প্রাণী একে অপরকে ভালোবাসুক।

তিনি অজ্ঞতা হতে মুক্তি লাভের শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যে; সকল প্রাণী কার্য-কারণ নীতিকে অবজ্ঞা না করুক এবং কার্যকারণ নীতিকে

সম্যকভাবে উপলব্ধি করুক।

উল্লেখিত বর্ণনার মাঝে প্রাণী জগতের প্রতি বুদ্ধের করুণাচিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের শান্তিসুখের ব্যাপারে বুদ্ধের মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে। পিতা-মাতা যেভাবে ছেলে মেয়েদেরকে ভালোবাসে, বুদ্ধও সেভাবে মানুষকে ভালোবাসেন এবং তিনি প্রার্থনা করে থাকেন পৃথিবীর সকল প্রাণী জন্ম মৃত্যুর এই সমুদ্র থেকে মুক্তিলাভ করে পরম সুখে বসবাস করুক।

২

জীবজগতের মুক্তির জন্যে বুদ্ধের পথনির্দেশনা

১। মোহ ও আকাঙ্খার সংগ্রাম মুখর এই জীবজগতে বুদ্ধের গবেষণালব্ধ বাণীর আবেদন সৃষ্টি করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই করুণাঘন বুদ্ধ নিজেই এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন।

বুদ্ধ বললেন, "আমি তোমাদেরকে একটি নীতিগর্ভ রূপক কাহিনী শুনাব।" তা হলো, "একদা এক গ্রামে একজন ধনী ব্যক্তি বসবাস করতেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে আগুন লেগেছিল। ধনী ব্যক্তিটি বাড়ীর বাহিরে কোন কাজে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে বাড়ীর ভিতরে তাঁর ছেলে মেয়েরা খেলায় নিবিষ্ট; আগুনের প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। এতে তিনি তীব্র আর্তনাদের সহিত ছেলেমেয়েদেরকে বাড়ীর ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ছেলে মেয়েরা তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলো না।"

উদ্বিগ্ন পিতা পুনঃ চিৎকার করে তাঁর ছেলে মেয়েদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, "তোমাদের জন্যে আমার নিকট অনেক চমৎকার খেলনার সামগ্রী আছে, বাড়ী থেকে বের হয়ে আস এবং খেলনাগুলো নাও।" এতে ছেলে মেয়েরা আগুনে দ্বগ্ধ ঘর হতে বের হয়ে আসলো।

এই পৃথিবীটাই হলো আগুনে প্রজ্জ্বলিত বাড়ী সদৃশ। মানুষেরা আগুনে দগ্ধ বাড়ীর মধ্যে অবস্হান করছে কিন্তু আগুনের প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। অথচ অসতর্কতার দরুন এই আগুনে দগ্ধ হয়ে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। তাই করুণাঘন বুদ্ধ এই অগ্নিদগ্ধ জীবজগতকে রক্ষার পথ আবিষ্কার করেছেন।

২। বুদ্ধ বললেন, "আমি তোমাদেরকে আরও একটি নীতিগর্ভ রূপ কাহিনী বলবো। একদা এক ধনী লোকের একমাত্র পুত্র তার পিতাকে ছেড়ে নিছক খেয়ালের বশে দূরে কোন এক স্হানে নিতান্ত গরীবের বেশে বসবাস করতো।"

"অনেক দিন পরে ধনী ব্যক্তিটি তার ছেলের খোঁজে বের হলো কিন্তু তার কোন হদিস পেলো না। সে তার সর্ব শক্তি নিয়োগ করেও ছেলের খোঁজ পেতে ব্যর্থ হলো।"

"বছর দশেক পরে ধনী লোকের ছেলেটি চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে তার পিতার বাড়ীর পার্শ্বে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরাঘুরি করতে লাগলো।"

"পিতা তার পুত্রকে দেখা মাত্রই সনাক্ত করতে পেরেছিলো এবং জাঁকজমক পূর্ণ বাড়ী থেকে কর্মচারী পাঠিয়ে আগন্তুককে বাড়ীতে আসতে বললো; সে ঐ জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদটির অবস্হা দেখে আশ্চর্য হয়েছিল। এতে আগন্তুকটি আতঙ্কিত হলো এবং তারা প্রতারণা করছে ভেবে তাদের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচার জন্যে বাড়ীতে যাবে না বললো। সে অনুভব করতে পারেনি যে ঐ প্রাসাদের মালিক স্বয়ং তার পিতা।"

"পিতা পুনঃ কিছু টাকা দিয়ে ছেলেকে ঐ বাড়ীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব পাঠালেন। ছেলেটি এই বারে কর্মচারীদের প্রস্তাবে রাজী হলো এবং একজন কর্মচারী হিসেবে ঐ বাড়ীতে অবস্হান করতে শুরু করলো।"

"যতদিন পর্যন্ত বাড়ীর সমস্ত স্হাবর অস্হাবর সম্পত্তির মালিক হিসেবে ছেলেকে দায়িত্ব দিতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত পিতা ছেলেকে আস্তে আস্তে বুঝাতে শুরু

করলো। কিন্তু এতেও ছেলে তার পিতাকে নিজের পিতা হিসেবে চিনতে পারলো না।"

"পিতা তার পুত্রের বিশ্বস্ততায় খুশি হলেন এবং তার জীবনের শেষ পরিণতির দিন ঘনিয়ে আসার কারণে একদিন তার সকল আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদেরকে ডেকে তার একমাত্র পুত্রকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, এখন থেকে আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে।"

ছেলেটি তার পিতার এরূপ স্বীকৃতিতে অবাক হলো এবং বললো, "আমি শুধু আমার পিতাকে পেলাম না এখন থেকে সমস্ত সম্পত্তির মালিকও আমি।"

বুদ্ধ এ নীতিগর্ভ কল্প কাহিনীর মাধ্যমে ধনী হিসেবে বুদ্ধকে (চিরশ্বাশ্বতঃ বোধিজ্ঞানকে) উপস্হাপন করেছেন এবং উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণকারী পুত্রকে এই জীবজগতের সাথে তুলনা করেছে। বুদ্ধের করুণা সমস্ত প্রাণী জগতের জন্যে; যা পিতা একমাত্র পুত্রের জন্যে করে থাকেন। পিতার ঐ ভালবাসায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা শিক্ষা এবং উন্নতি সাধনের জন্যে অতীব মূল্যবান দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

৩। বৃষ্টির জল যেমন সমস্ত উদ্ভিদের জন্যে, তেমনি বুদ্ধের করুণাও সকল জীবজগতের জন্যে। ইহার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই উদ্ভিদজগত তাদের স্ব স্ব প্রয়োজনে জল গ্রহণ করে, আর জীবজগত তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে এবং পরিবেশে মহিমান্বিত হয় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে।

৪। পিতা মাতারা তাঁদের সন্তানদেরকে সমভাবে ভালোবাসেন কিন্তু অসুস্হ দুর্বল সন্তানদের প্রতি তাঁদের বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

এরূপে বুদ্ধের করুণাময় চিত্ত সবার জন্যে সমান, কিন্তু অবিদ্যার কারণে দুঃখভারাক্রান্ত মানুষের জন্যে বুদ্ধের বিশেষ মনোভাবও প্রকাশ পায়।

সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করে, এতে কোন অঞ্চল বিশেষের প্রতি তার পক্ষপাতের অবকাশ নেই। সেরূপ বুদ্ধের করুণাময় চিত্ত সকল প্রাণীকে পরিবেষ্টিত করে, তাদেরকে কুশল কাজে অনুপ্রাণিত করে এবং অকুশল কাজ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে। এভাবে তিনি মানুষকে অবিদ্যার কালো ছায়া থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে যায়।

বুদ্ধ তাঁর মৈত্রীর মধ্যে পিতার ন্যায় এবং করুণার মধ্যে মাতার ন্যায়। অবিদ্যা এবং পার্থিব আকাংখায় তাড়িত হয়ে মানুষ অত্যধিক ভাবাবেগে অনেক কিছুই করে বসে। বুদ্ধ নিজেও গভীর অনুভূতিপূর্ণ, কিন্তু তাঁর এই অনুভূতিতে কাজ করে সকল প্রাণীর প্রতি করুণাময় মনোভাব। প্রাণীজগত বুদ্ধের অপার করুণাময় চিত্তের কাছে ঋণী এবং অবশ্যই একদিন বুদ্ধ নির্দেশিত মুক্তি পথের যাত্রী তারা হবেনই; যেহেতু প্রাণীজগত তাঁর অনুসারী এবং তাঁর সন্তান/সন্ততি সদৃশ।

৩
চিরন্তনসত্য বুদ্ধ

১। সাধারণ জনগণ বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধ একজন রাজপুত্র হিসেবে কিভাবে বোধিজ্ঞান অর্জন করা যায়, তা শিক্ষা করেছিলেন। আসলে বুদ্ধ সর্বদাই এই পৃথিবীতে অবস্হান করছেন যাঁর কোন শুরু এবং শেষ নেই।

অবিনশ্বর বুদ্ধ হিসেবে, তিনি সবার নিকট পরিচিত এবং তিনি মানুষের মুক্তির পন্হা হিসেবে সকল প্রকার পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধের অবিনশ্বর ধর্ম শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি নেই। তিনি পার্থিব জগতের সমস্ত কিছু সম্পর্কে জানেন এবং ঐ শিক্ষা তিনি সবাইকে দিয়ে থাকেন।

এই পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করাটা সত্যিই কষ্টকর। যা সত্য বলে মনে হয় তা সত্য নয়; আর যা মিথ্যা বলে মনে হয় তা মিথ্যা নয়। অনভিজ্ঞ বা সাধারণ

চিরন্তনসত্য বুদ্ধ ও তাঁর মহিমা

মানুষ এ পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বুঝতে পারে না। একমাত্র বুদ্ধই এই পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম। তাই তিনি এর স্বরূপ সম্পর্কে সত্য, মিথ্যা, ভালো, মন্দ ইত্যাদি মন্তব্য করেন না। তিনি সহজ ভাষায় এই পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

বুদ্ধ যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো এরূপ, সকল প্রাণী তাদের স্ব স্ব স্বভাব, কাজ এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে কুশল কর্মের মূল অনুশীলন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা পৃথিবীর সকল প্রকার হাঁ সূচক এবং না সূচক মন্তব্যকে অতিক্রম করেছে।

২। বুদ্ধের শিক্ষা শুধুমাত্র বাক্যের মাধ্যমে নয়, তাঁর শরীরের মাধ্যমেও শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও বুদ্ধের জীবন (বোধিময় জীবনাদর্শ) অবিনশ্বর তবুও প্রবল ভোগাকাংখীদের জন্য তাঁর মৃত্যু জাগতিক পরিণতির একটি কৌশল মাত্র।

এক সময় এক চিকিৎসক কোন কাজে বাড়ি থেকে বাইরে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর ছেলে/মেয়েরা ঘটনাক্রমে বিষাক্ত ঔষধ সেবনে অসুস্হ হয়ে পড়লো। যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন তাদের অসুস্হতা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের জন্যে প্রতিষেধক তৈরী করলেন।

তাদের মধ্যে কেহ কেহ অল্প অসুস্হতার জন্যে প্রতিষেধক সেবন করে আরোগ্য লাভ করলো, এবং কেহ কেহ বেশী অসুস্হতার জন্যে প্রতিষেধক সেবন হতে বিরত থাকলো।

চিকিৎসক তার অগাধ পৈতৃক ভালোবাসার কারণে তাঁর অসুস্হ ছেলে মেয়েদেরকে আরোগ্য লাভের জন্য এক আশ্চর্য্যজনক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "আমাকে অনেক দূরে ভ্রমণে যেতে হবে। আমি বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েছি এবং একদিন মৃত্যু মুখে পতিত হবো। যদি আমি তোমাদের পাশে থাকতে পারতাম তাহলে তোমাদের সেবা যত্ন করতে পারতাম, কিন্তু দূরে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে তোমাদের অবস্হা ক্রমান্বয়ে খারাপ হবে। তাই তোমরা যদি শুন যে, আমি মৃত্যুবরণ করেছি, তাহলে তোমাদের কাছে আমার

সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই প্রতিষেধকগুলো সেবন করিও এবং বিষাক্রান্ত অসুস্হতা থেকে সুস্হতা লাভ করিও। তারপর চিকিৎসক অনেক দূরে ভ্রমণে বের হলেন এবং একদিন তিনি খবর পাঠালেন যে তিনি আর এই ধরাধামে বেঁচে নেই। পিতার এই দুঃসংবাদ পেয়ে ছেলে/মেয়েরা অত্যন্ত কষ্ট পেলো এবং বুঝতে পারলো যে তারা আর পিতার সহযোগিতা লাভ করতে পারবে না। অবশেষে পিতার শেষ অনুরোধের কথা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে স্মরণ করলো এবং প্রতিষেধক সেবন করে আরোগ্য লাভ করলো।

চিকিৎসক পিতার এই সিদ্ধান্তকে মানুষের দোষারোপ করা উচিৎ নয়। বুদ্ধও ঐ পিতার ন্যায়। তিনিও যারা প্রবল তৃষ্ণার বন্ধনে আবদ্ধ তাদেরকে রক্ষার জন্যে জন্ম মৃত্যুর এই কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী

১

বুদ্ধের শরীরের ৩ প্রকার লক্ষণ

১। বুদ্ধকে উপলব্ধি করার জন্যে তাঁর দৈহিক অবয়ব এবং জাগতিক গুণাবলী সন্ধান করার প্রয়োজন নেই। দৈহিক অবয়ব অথবা জাগতিক গুণাবলী কোনটিই প্রকৃত বুদ্ধ নহে। শাশ্বতঃ বুদ্ধ হলেন সর্বজ্ঞতাজ্ঞান (চারি আর্য সত্য জ্ঞান)। প্রকৃত বুদ্ধকে জানতে হলে তাই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের সাধনা করতে হবে।

যদি কেহ বুদ্ধের পরম উৎকৃষ্ট দৈহিক অবয়ব দেখে মনে করে যে সে বুদ্ধকে দর্শন করেছে ; ইহা হবে তার ভুল চোখে দেখা। প্রকৃত বুদ্ধ অবয়ব দ্বারা বুঝা যায় না। বুদ্ধের গুণাবলীর জাগতিক বর্ণনার দ্বারাও তাঁকে বুঝা যায় না। বাহ্যিক জগতের ভাষায় তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করাও সম্ভব নহে।

যদিও আমরা বুদ্ধের অবয়বের ব্যাপারে কথা বলি। আসলে শাশ্বত বুদ্ধের কোন অবয়ব নেই। কিন্তু যে কোন অবয়বের মাধ্যমে আমরা তাঁকে প্রতীয়মান করতে পারি। যদিও আমরা তাঁর গুণাবলীর কথা বর্ণনা করি, আসলে শ্বাশ্বত বুদ্ধ কোন গুণাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু তাঁকে পৃথিবীর যে কোন সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীতে শোভিত করা যায়।

সুতরাং যদি কেহ সাধারণ মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধের অবয়বকে দর্শন করেন, স্বতন্ত্রভাবে তাঁর গুণাবলীকে অনুধাবন করেন, যদি সে বুদ্ধের অবয়ব ও গুণাবলীতে আসক্তিপরায়ণ না হন; তাহলে তিনি বুদ্ধকে দেখার ও বুঝার ক্ষমতা অর্জন করবেন।

২। বুদ্ধের মনটাই সর্বজ্ঞতাজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এর কোন দৈহিক অবয়ব এবং বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। তাই ইহা সর্বদা সর্বজ্ঞতার স্বরূপে স্থিতিশীল আছে এবং থাকবে। ইহা এমন কোন শারীরিক অবকাঠামো নয় যে খাদ্যের মাধ্যমে সংরক্ষন করতে হবে। ইহা এমন একটি শাশ্বত দেহ যার অবয়ব বোধি চিত্ত তথা জ্ঞান দ্বারা গঠিত। তাই এই ধর্মে কায়িক বুদ্ধের কোন ভয় নেই এবং রোগ নেই; তিনি শাশ্বত অবিনশ্বর।

অতএব, সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জিত হলে বুদ্ধ কখনও অন্তর্ধান হন না। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান প্রজ্ঞার আলোর ন্যায় আগমন করে এবং তা প্রাণীজগতকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নতুন জীবনের পথনির্দেশনা দিয়ে থাকে। প্রজ্ঞার আলো, প্রাণীজগতকে বুদ্ধের জ্ঞানজগতে প্রবেশ করার জন্য অনুপ্রেরণা দান করে।

এই জ্ঞান যাঁদের মধ্যে উদয় হয় তাঁরাই বুদ্ধপুত্র হিসেবে পরিচিত হন এবং তাঁরা বুদ্ধের ধর্মকে রক্ষা করেন, সম্মান করেন, পরিশেষে ধর্ম তাঁদের দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করে। বুদ্ধের শক্তির চেয়ে বিস্ময়কর শক্তি আর কিছুই নেই।

৩। বুদ্ধের শরীর তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশকে বলে ধর্মকায়া, দ্বিতীয় অংশকে বলে সম্ভাবনাময় কায়া বা সম্ভোগা কায়া এবং তৃতীয় অংশকে বলে নির্মিত কায়া।

ধর্মের অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে এমন কায়াকে ধর্মকায়া বলা হয়। ইহার মধ্যে সত্যেরও অস্তিত্ব রয়েছে। সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধের কোন স্বরূপ অথবা রং নেই। স্বরূপ এবং রং না থাকার দরুন বুদ্ধের আগমন এবং প্রস্হানের স্হানও নেই। নীল আকাশের ন্যায় বুদ্ধ (জ্ঞান) সব জায়গায় অবস্হান করছেন, তাঁর অস্তিত্ব নেই এমন কোন স্হান নেই।

সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে বুদ্ধের দৈহিক অস্তিত্ব বিদ্যমান কিন্তু আসলে অস্তিত্ব বিদ্যমান নয়। আবার মানুষেরা ভুলে যাওয়ার দরুন তিনি অন্তর্ধানও হন না। আসলে বুদ্ধের অস্তিত্বের এমন কোন অস্তিত্ব বা এর আগমন ও অন্তর্ধানের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। মানুষের সুখের সময়ে তার অস্তিত্বের কোন বাধ্যবাধকতা

নেই। আবার মানুষের অমনোযোগিতা এবং অলসতার দরুন অন্তর্ধানেরও কোন প্রয়োজন নেই। মানুষের সকল ধারণাকে তিনি অতিক্রম করেছেন।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধের দৈহিক অস্তিত্ব দেখলে বলতে হবে তিনি সর্বস্হানে বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্ব সর্বকালের জন্যে। এমনকি বুদ্ধের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই অথবা তাঁর অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে এমন লোকের জন্যেও।

৪। সম্ভাবনাময় কায়া বা সম্ভোগকায়া মানে যার মধ্যে করুণা এবং প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে কোন অবয়ব বা স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। জন্ম মৃত্যুর প্রতীকের মাধ্যমে এবং প্রার্থনা ও বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ করার মাধ্যমে দুঃখ যন্ত্রণাময় এই পৃথিবী থেকে মুক্তির উপায় লাভের প্রেরণা উৎপাদক সম্ভোগকায়া প্রতীয়মান হয়।

এই কায়ার সারমর্ম হলো করুণা এবং এই করুণার মাধ্যমে মুক্তিলাভের সমস্ত উপায়ই বুদ্ধ মুক্তিলাভী সবার জন্যে রেখে গেছেন। ইহা আগুনের ন্যায়। যদি কোন দাহ্যবস্তুতে একবার আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা জ্বালিয়ে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে। এরূপে বুদ্ধের করুণা ও জীবজগতের পার্থিব আবেগজাত ভোগাকাঙ্খা যতদিন নিঃশেষ না হবে ততদিন পর্যন্ত জীবজগতের উদ্ধারে বিদ্যমান থাকবে। প্রবল বাতাস যেমন ধূলাবালিকে দূরে সরিয়ে দেয় তেমনি বুদ্ধের করুণা নামক বাতাস মানুষের দুঃখ নামক সমস্ত ধুলাবালিকে মুছিয়ে দেয়।

নির্মিত বা নির্মাণ কায়া মানে, বুদ্ধ নির্দেশিত সম্ভাবনাময় মুক্তি লাভের পথ। শত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও সম্যক পথে উদ্যম প্রচেষ্টা দ্বারা নিজে উদ্ধার পাওয়া যে সম্ভব, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনের জন্যেই বোধিসত্ত্ব স্ব শরীরে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর অমিত পারমি শক্তির অধিকারী হয়ে, জনগণকে বুদ্ধের স্বভাব, প্রকৃতি, ক্ষমতাসহ আনুসাঙ্গিক জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্ম প্রচার, রোগ, উপদ্রব, বার্ধক্য ও মৃত্যু লাভের মাধ্যমে দর্শন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ জনগণের স্বাভাবিক জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে বুদ্ধ নিজের শরীরকে অসুস্হতা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধের দেহ আসলে একটি ধর্মকায়া কিন্তু মানুষের ভিন্ন স্বভাব প্রকৃতির জন্যে বুদ্ধের দেহও ভিন্নতা লাভ করেছে। যদিও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হতে বুদ্ধের এই দেহে বিভিন্ন ইচ্ছা আকাংখার ভিন্নতা দেখা যায় তার পরেও ইহা মানুষের কর্ম এবং কর্মদক্ষতার প্রেরণা দানের জন্যেই সৃষ্ট। বাস্তবতার দিক থেকে দেখলে ধর্মের সত্যতার মধ্যেই বুদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে।

যদিও উপরোক্তভাবে বুদ্ধের ৩ টি স্বরূপ দেখা যায় কিন্তু তাঁর মূল শিক্ষা ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন; আর তা হলো সমস্ত জীবজগতকে রক্ষা করা।

যে কোন পরিস্থিতিতে বুদ্ধ তাঁর বিশুদ্ধতার মধ্যে সুস্পষ্ট।

তথাপি, এই সুস্পষ্টতা মানে বুদ্ধ নয়, কারণ বুদ্ধ কোন অবকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুদ্ধত্ব মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করে। সত্য ধর্ম অনুসন্ধানকারীর সম্মুখে বুদ্ধ স্বয়ং সত্যজ্ঞান উপলব্ধির মধ্য দিয়ে উপস্থিত হন।

২
বুদ্ধের আবির্ভাব

১। ইহা বাস্তব যে এই পৃথিবীতে বুদ্ধের উৎপত্তি বড়ই দুর্লভ। কিন্তু এখনো বুদ্ধের শাসন বিদ্যমান। তাই বোধিজ্ঞান অর্জন সম্ভব, যাবতীয় সন্দেহের জাল ছিন্ন করা সম্ভব, তৃষ্ণার মূল উৎপাটন সম্ভব, অকুশল ধর্ম উৎপন্নের সমস্ত ছিদ্র ও বন্ধ করা সম্ভব। সম্পূর্ণ রূপে অনাবৃত অবস্থায় বুদ্ধ এখনো এই পৃথিবী প্রদক্ষিন করছেন। এই পৃথিবীতে বুদ্ধ ব্যতীত শ্রদ্ধার দ্বিতীয় কেহই নেই।

দুঃখ যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত পৃথিবীতেই বুদ্ধ আবির্ভূত হন। কারণ তিনি দুঃখ ক্লিষ্টকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তির বাণী বা ধর্ম প্রচার এবং সত্য ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে উপকৃত করা।

বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী

মিথ্যা ও অবিচারে পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রচার সত্যিই কঠিন। মানুষ যেখানে অসাচ্ছন্দ্য ও অতৃপ্ত কামনা পরিপূরনের অর্থহীন সংগ্রামে রত, সেখানেও ধর্মের প্রচার বড়ই কঠিন। বুদ্ধ নিজেও এ কঠিন বাস্তবতার মুখামুখি হয়েছিলেন। তাঁর মহামৈত্রী ও করুণার মাধ্যমে তা তিনি অতিক্রম করেছেন।

২। বুদ্ধ সকলের জন্যে একজন সর্ব্বোত্তম বন্ধু। যদি কেহ এই পৃথিবীর জাগতিক মহা দুঃখে কালাতিপাত করতে দেখেন, তাহলে বুদ্ধ তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান এবং করুণার মাধ্যমে তার দুঃখের ভার লাঘবে ব্রতী হন। যদি কেহ মোহের অন্ধকারে সঠিক পথ খুঁজে না পায়, তাহলে তিনি তাকে জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে মোহ হতে মুক্তি লাভে সহায়তা করেন।

গরুর বাছুর যেমন তার মায়ের সাথে থেকে আনন্দ উপলব্ধি করে, তেমনি বুদ্ধের শিক্ষা যারা গ্রহণ করে তারাও শত প্রতিকুল পরিস্থিতিতে বুদ্ধের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে পারে না; কারণ বুদ্ধের শিক্ষা তাদের জীবনে সেই আকর্ষণীয় সুখ শান্তি বয়ে আনে।

৩। যখন চন্দ্র অস্ত যায় তখন মানুষেরা বলে, চন্দ্র অস্ত গমন করেছে; আবার যখন চন্দ্র উদিত হয়, তখন সবাই বলে, চন্দ্র উদিত হয়েছে। আসলে চন্দ্র অস্ত গমনও করেনি এবং উদিতও হয়নি, চন্দ্র এই পৃথিবীর কক্ষপথে ওভাবে ঘুরপাক দিচ্ছে। কিন্তু সদা সর্বদা আকাশকে এই চন্দ্র আলোকিতই করে যাচ্ছে। বুদ্ধেরও ঠিক একই রূপ; তিনি আবির্ভূতও হননি আবার অর্ন্তধানও হননি। তিনি তাঁর মহামৈত্রী করুণার মাধ্যমে যে শিক্ষা মানুষকে দিয়ে গেছেন সেখানেই তিনি আবির্ভূত এবং অন্তর্ধান হচ্ছেন; মানুষ বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলন করলে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়; এবং অনুশীলন না করলে বুদ্ধের তিরোধান হয়।

সাধারণ লোকেরা চন্দ্রের একটি পর্যায়কে পূর্ণচন্দ্র, আবার অন্য একটি পর্যায়কে অর্ধচন্দ্র হিসেবে বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে চন্দ্র সবসময় এক এবং গোলাকার; ইহা বৃদ্ধিও পাচ্ছে না; আবার ক্ষয়প্রাপ্তও হচ্ছে না। বুদ্ধও বিশেষ ক্ষেত্রে চন্দ্রের ন্যায়। মানব চোখে বুদ্ধ পরিবর্তিত হয়ে পুনঃ আবির্ভূত হচ্ছেন বলে ধারণা

করা হয়, কিন্তু আসলে বুদ্ধের কোন পরিবর্তন নেই; তিনি বিমুক্তি মার্গ প্রভাস্বর জ্ঞানাধার রূপে শাশ্বত ও চিরন্তন।

চন্দ্র ঝামেলাপূর্ণ শহর, নিদ্রিত গ্রাম, পাহাড় ও নদী সব জায়গায় আলোকিত করে। চন্দ্রকে পুকুরের গভীরে, জগের পানির ভেতরে, শিশির বিন্দুর ভেতরে এবং হেলানো পাতার মধ্যেও দেখা যায়। যদি কেহ ১০০ মাইল হাঁটে, চন্দ্রও তার সাথে সাথে থাকবে। সাধারণত মানুষেরা মনে করতে পারে, চন্দ্রের স্থান পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আসলে তা নয়। বুদ্ধও চন্দ্রের ন্যায় অপরিবর্তিত; কিন্তু মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং বাহ্যিক রূপের স্পষ্টতঃ পরিবর্তন হচ্ছে। সত্য কথা হলো, বুদ্ধ তাঁর শিক্ষার সারতত্ত্বের মধ্যে অবস্থান করছেন; সেখানেই তিনি শাশ্বত এবং চিরন্তন।

৪। বুদ্ধের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন- যখন কারণ এবং শর্তগুলো অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে তখন বুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আবার যখন কারণ এবং শর্তগুলো প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে তখন এই পৃথিবীতে বুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না।

বুদ্ধের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি দুটি থাকলেও বুদ্ধাংকুর সর্বদা একই অবস্থায় থাকে। বুদ্ধ শিক্ষার এই মূল উপাদানগুলো জেনে, বুদ্ধত্ব প্রার্থীগণকে মুক্তির বাহ্যিক পরিবর্তন, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনও মানুষের অস্থির চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বোধি লাভে এবং প্রকৃত প্রজ্ঞা লাভে সচেষ্ট হতে হবে।

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে বুদ্ধ মানে তাঁর শারিরীক অবয়ব নয়, জ্ঞান বা বোধিকেই বুঝতে হবে। আমরা শারীরিক অবয়বকে কিছু রাখার পাত্র হিসেবে ধারণা করতে পারি। যখন ঐ পাত্র বোধি বা জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তখন তাকে বুদ্ধ বলা যেতে পারে। সুতরাং কেহ যদি বুদ্ধের শারীরিক অবয়বের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তার অনুপস্থিতিতে কান্না কাটি করে, তার পক্ষে প্রকৃত বুদ্ধকে দর্শন করা সম্ভব নয়।

বাস্তবতার দিক থেকে দেখলে সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ভালো-মন্দ, আসা-যাওয়া, এবং দৃশ্য-অদৃশ্যের উর্দ্ধে অবস্থান করছে। সমস্ত পার্থিব বস্তু অসার এবং সম্পূর্ণ

এক ও অভিন্ন।

ভ্রান্ত ধারণা বশে যাদের দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হয় না তাদের কারণেই এই প্রভেদদৃষ্টি সৃষ্টি হয়। তাই বুদ্ধের প্রকৃত অবয়বে প্রতীয়মান ও অপ্রতীয়মান কোনটিই লক্ষ্য করা যায় না।

৩

বুদ্ধের গুণাবলী

১। পাঁচটি গুণাবলীর দ্বারা বুদ্ধ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। এগুলো হলো ঃ ১) উচ্চতর মার্গের পথ প্রদর্শক; ২) উচ্চতর দৃষ্টি সম্পন্ন; ৩) সর্বজ্ঞতাজ্ঞান; ৪) উচ্চতর দেশক ও ৫) বুদ্ধের শিক্ষা ও অনুশীলনের দিকে মানুষকে ধাবিত করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

এছাড়া আরও ৮টি গুণাবলী আছে যা বুদ্ধগণ প্রাণী জগতের সুখ শান্তি কামনায় প্রয়োগ করতে পারেন। এগুলো হলো ঃ ১) বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক এই পার্থিব জগতের উপকার সাধনের ক্ষমতা; ২) কুশল ও অকুশলের প্রকৃত স্বরূপ জানার ক্ষমতা; ৩) প্রাণী জগতের সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের জন্যে সঠিক পথ নির্দেশনার ক্ষমতা; ৪) সকলকে একই পথে পরিচালনা করার ক্ষমতা; ৫) অহংকার এবং দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করার ক্ষমতা; ৬) বুদ্ধ দ্বারা যা ভাষিত হয়েছে তা পালন করার ক্ষমতা; ৭) তিনি যা করেছেন তা প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং ৮) তিনি যা বলেছেন তা চর্চা করার ক্ষমতা। এই শর্তগুলো পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে তাঁর করুণাঘন চিত্তের আশীর্বাদ পুষ্ট হওয়া যায়।

আবার ভগবান বুদ্ধ, ভাবনার মাধ্যমে আপন চিত্তকে তিনি সতেজ রেখে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা চিত্তের মাধ্যমে প্রাণী জগতকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করেছেন। তিনি প্রাণী জগতের সকলের সাথে সমান ভাবে সম্পর্ক রাখেন, এবং তাদেরকে পাপমুক্ত চিত্ত তৈরী করতে সহযোগিতা করেন। তিনি

প্রাণী জগতের সকলের সমভাবে সুখময় জীবন কামনা করেন।

২। বুদ্ধ জগতের সকলেরই পিতা মাতা সদৃশ। শিশুর জন্মের ১৬ মাস পরে পিতা-মাতা খুবই সহজ সরল শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে আপন শিশুর সাথে কথা বলে। অতঃপর ধীরে ধীরে প্রাপ্ত বয়স্কদের ন্যায় কথা বলার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই বিশ্বব্রম্মাণ্ডের হিতকামী কর্তা হিসেবে বুদ্ধ তাই সর্বপ্রথমে পিতা মাতার চিত্তে সবার যত্ন নিয়ে থাকেন এবং পরে নিজেকে নিজে যত্ন নেয়ার জন্যে ছেড়ে দেন। তিনি প্রথমে মানুষকে নিজের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেন সে ব্যক্তির আপন বিচার বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ে; পরে তাদেরকে শান্ত এবং নিরাপদ স্হানে নিয়ে আসেন।

বুদ্ধ নিজের ভাষায় যা বর্ণনা করেন না কেন, তা যদি বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে সহজ ভাবে বুঝতে পারে এরূপ ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন অসংখ্য উপমা, গল্প, রূপকথার মাধ্যমে।

বুদ্ধের চিত্তজগত মানুষের চিত্তজগত থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এর পরিপূর্ণ স্বরূপ আমাদের সাধারণ বর্ণনায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীর মাধ্যমে তার ধারণা দেয়া যায় মাত্র।

গঙ্গার পানি ঘোড়া ও হাতির পায়ের দ্বারা ঘোলাটে হয়ে যায়। মাছের ও কাছিমের নড়া চড়ার দ্বারাও ঘোলাটে হয়ে যায়; কিন্তু তবুও নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছে স্বচ্ছতার সাথে কারও বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে। ঠিক সেরূপে বুদ্ধও একটি মহা নদী সদৃশ। মাছ এবং কাছিম পানির গভীরতার মাঝে সাতাঁর কাটে এবং স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কিন্তু মানব সমাজের কলুষিত প্রতিকুলতার সত্ত্বেও বুদ্ধের ধর্ম চির প্রবাহমান পুত পবিত্র এবং নিরুপদ্রব। এই ধর্ম আয়ত্বকরণের সামান্য চেষ্টাও তাই বৃথা যায় না; তা কর্মফলে পরিণত হয়।

৩। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতাজ্ঞান সমস্ত সংস্কারকে ছিন্ন করেছে এবং ইহা বাস্তব সম্মত এক প্রকার জ্ঞান যা সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি একজন সর্বজ্ঞ, সেহেতু তিনি সকলের ধ্যান ধারণা এবং অনুভূতি সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম।

বুদ্ধের প্রকৃতি ও গুণাবলী

স্বর্গীয় তারকারাজির আলোকচন্দ্রিমা যেমন প্রশান্ত সমুদ্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তদ্রুপ মানুষের চিন্তা ভাবনা, আচার-আচরণ, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বুদ্ধের প্রজ্ঞারূপ গভীর সমুদ্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সে কারণেই বুদ্ধকে সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ বলে সবাই জানেন।

বুদ্ধের প্রজ্ঞা, মানুষের অনুর্বর মনকে উর্বরতার দিকে ধাবিত করে এবং তাদেরকে প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে। এই পৃথিবীর গুরুত্ব, কার্যকারণ নীতি, উৎপত্তি এবং বিলয় সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। সত্যিই বুদ্ধের প্রজ্ঞা ব্যতীত জনসাধারণ এই পৃথিবীকে সঠিকভাবে বুঝা কি সম্ভব ছিলো ?

৪। বুদ্ধ তাঁর বোধিজ্ঞান অর্জনের সাধনায় বোধিসত্ত্ব কালে সর্বদা বুদ্ধ হিসেবে প্রতীয়মান হন। সময়ে তিনি শয়তানের রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হন; সময়ে তিনি মহিলা, দেবতা, রাজা, অথবা রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবেও আবির্ভূত হন। আবার সময়ে তিনি বেশ্যালয় এবং জুয়ার আড্ডায়ও আবির্ভূত হন, এই সকল বিপথগামীদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে।

রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি রোগারোগ্যকর চিকিৎসক রূপে আবির্ভূত হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তিদের জন্যে তিনি করুণা প্রদর্শন করেন। এগুলো যারা বিশ্বাস করে তারা চির অমরত্ব লাভ করে। যারা দাম্ভিক ও আত্মবাদী, বুদ্ধ তাদের জন্যে অনিত্য বা অচিরস্থায়ী বা পরিবর্তনশীলতার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর এই মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে যারা পার্থিব আনন্দ বোধ করছে তিনি তাদের জন্যে নম্রতা ও আত্মোৎসর্গের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

বুদ্ধের কাজ হলো, সর্ব বিষয়ে এবং সকল সময়ে তাঁর প্রকৃত শিক্ষা (ধর্মস্কন্ধ) সকলকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান করা। সুতরাং বুদ্ধের করুণা এবং মৈত্রীর জোয়ারে এই ধর্মস্কন্ধ হতে আবহমান কাল ধরে সীমাহীন আলো প্রজ্জ্বলিত হবে এবং ইহা মানব সমাজের মুক্তির সহায় হবে।

৫। এই পৃথিবী একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড সদৃশ প্রতিনিয়ত ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে এবং পুনরায় নির্মিত হচ্ছে। জনসাধারণ প্রতিনিয়ত নিজেদের অজ্ঞতার অন্ধকারে বিভ্রান্ত হচ্ছে। রাগজনিত কারণে তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, প্রতিহিংসাপরায়ণ হচ্ছে, কুসংস্কারপরায়ণ হচ্ছে এবং বৈষয়িক হয়ে উঠছে। শিশুর জন্যে যেমন মায়ের স্নেহের প্রয়োজন তদ্রুপ সবার জন্যে বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণাময় ছায়ার প্রয়োজন।

বুদ্ধ হলেন এই ত্রিলোকের পিতা এবং সমগ্র প্রাণীজগত হলো তাঁর সন্তান সন্ততি। বুদ্ধ হলেন সকল পবিত্র ব্যক্তিদের পবিত্রতম। এই পৃথিবী আগুন ও মৃত্যুর ভারে জর্জরিত হয়ে ধ্বংসের শেষ অবস্হায় উপনীত হয়েছে। যেদিকে যায় না কেন সেদিকেই শুধু দুঃখের হাহাকার ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না, তাই তারা বৃথা বৈষয়িক শান্তি সুখ অন্বেষণ করে।

বুদ্ধ দেখেছিলেন এই পৃথিবী একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড সদৃশ। তাই তিনি সংসার ত্যাগ করে শান্ত সমাহিত অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি তার মহাকরুণাভরা অন্তরে আমাদেরকে উদাত্ত আহ্বান করেছেনঃ "এই পৃথিবীর পরিবর্তন এবং দুঃখ কষ্টের কারণ আমি জেনেছি; তোমরা সবাই অবোধ এবং অমনোযোগী। আমিই একমাত্র তোমাদের দুঃখমুক্তির পথপ্রদর্শক।"

বুদ্ধ হলেন ধর্মরাজ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে পারেন। এ পৃথিবীতে বুদ্ধের আগমন সকলের জন্যে আশীর্বাদ সদৃশ। জনগণের দুঃখমুক্তির জন্য তিনি ধর্মোপদেশ দিয়ে থাকেন কিন্তু স্হূল বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ লোভের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে বুদ্ধের ঐ শিক্ষার প্রতি কর্ণপাত করে না।

যারা বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে এবং প্রতিপালন করার চেষ্টা করে, তাঁরা মোহ মুক্ত হয়ে দুঃখমুক্তি লাভ করে জীবন যাপন করেন। বুদ্ধ বলেন, "সাধারণলোক নিজেদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে রক্ষিত হতে পারে না, কিন্তু যুক্তি সঙ্গত বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁরা আমার ধর্মে প্রবেশ করতে পারবে।" সুতরাং সকলকে বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ

করতে হবে এবং ইহাকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে।